রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর কাদম্বরী ------ ঘটনার অন্তরালে ৩

কাদম্বরীর মৃত্যুর পর তার আশেপাশের সমসাময়িক ঘটনার টুকরো গুলো জোড়া দিলে একটা সামগ্রিক ছবি তৈরী করা হয়তো সম্ভব হবে। হয়তো কোন একটি মনোপীড়া থেকে নয়, সম্মিলিত কয়েকটি মানসিক ধাক্কা তার পক্ষে সামলানো অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তাই মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা কষ্টের ঝরনাগুলো হঠাৎ আঘাতে নিজেকে হারিয়ে দুকূল প্লাবিত করে চলে গেলো। জ্যোতিরিন্দ্র বেশ খাম খেয়ালী মানুষ ছিলেন। কিছুটা সংসার উদাসীনও ছিলেন। নতুন নতুন নাটক, গান লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, নিজের যা ভালো লাগতো তাকেই প্রাধান্য দিতেন। তারউপর সত্যেন্দ্রনাথ - জ্ঞানদানন্দিনী তখন কোলকাতায় ফিরে এসেছেন। তাদের সাহচর্য, তাদের ছেলেমেয়েদের সাহচর্য তাকে কিছুটা স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে সরিয়েও এনেছিল। জ্ঞানদানন্দিনীর উগ্র আধুনিক চলাফেরার প্রতি জ্যোতিরিন্দ্রের মোহ জন্মেছিল। তিনি অনেকটা সময়ই সেই বাড়িতে পরে থাকতেন। রবীন্দ্রনাথের ভাতিজি ইন্দিরা কাদম্বরীর মৃত্যু সম্পর্কে লিখেছেন, “জ্যোতিকাকামশাই প্রায়ই বাড়ি ফিরতেন না। তার প্রধান আড্ডা ছিল বিজিতলাওয়ে আমাদের বাড়ি। আমার মা জ্ঞানদানন্দিনীর সঙ্গে ওর খুব ভাব ছিল”। এরই মধ্যে একদিন অভিমানীনি কাকীমা তাকে বলেছিলেন তাড়াতাড়ি ফিরতে। গানে গানে আড্ডায় আড্ডায় সেদিন এত দেরী হয়ে গেলো যে কাকাবাবুর আর বাড়িই ফেরা হলো না। প্রবল অভিমানে কাকীমা ধ্বংসের পথ বেছে নিলেন।

আবার রবীন্দ্রনাথের ছোটবোন বর্নকুমারীকে প্রশ্ন করে অমল হোম শুনেছিলেন, তখনকার দিনের বিখ্যাত অভিনেত্রী মতান্তরে নটী বিনোদিনীর সাথে জ্যোতিরিন্দ্রের ভীষন অন্তরংগতা জন্মেছিলো। জ্যোতিরিন্দ্রের কোটের পকেট থেকে কাদম্বরী বিনোদিনীর কয়েকটি চিঠি পান, যেগুলো তাদের মধ্যের অন্তরংগতার স্বাক্ষরই বহন করে। সেই চিঠিগুলো পেয়ে কাদম্বরী সংসারে নিস্পৃহ সময় কাটান বেশ কিছুদিন এবং তার পর পরই আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুর আগে তিনি লিখে গিয়েছিলেন, এই চিঠি গুলোই তার মৃত্যুর কারন, মহর্ষির আদেশে সেই চিঠিগুলো ও সাথে কাদম্বরীর লেখা আত্মহত্যার স্বীকারোক্তিটি নষ্ট করে ফেলা হয়। কাজী আবদুল ওদুদ লিখেছেন যে, তিনি ঠাকুরবাড়ির একজন

বিশ্বস্ত ব্যাক্তির কাছে শুনেছেন, যে মহিলার সাথে জ্যোতিরিন্দ্রের অন্তরংগতা জন্মেছিল তিনি অভিনেত্রী নন, কিন্তু তার কারনে আগেও একবার কাদম্বরী আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেছিল। তবে তৎকালীন রুচি ও রীতির পরিপ্রেক্ষিতে জ্যোতিরিন্দ্রের কোন থিয়েটারের অভিনেত্রী কিংবা নটীর সান্নিধ্যে আসাও বিরাট কিছু ব্যাপার নয়।

নিঃসন্তান কাদম্বরীর মধ্যে একটি সন্তানের জন্য তীব্র আকাংঙা ছিল। তিনি শিশুদেরকে প্রচন্ড ভালোবাসতেন। জানকীনাথ ও স্বনর্কুমারীর ছোটমেয়ে ঊর্মিলাকে নিজের কাছে রেখে সন্তান স্নেহে মানুষ করছিলেন তিনি। তার কাছেই ঊর্মিলা বড় হচ্ছিল তার মেয়ে হয়ে। একটু বড় হয়ে স্কুলে যাওয়া শুরু করার দুমাসের মধ্যেই তেতলার সিড়ি থেকে একা নামতে গিয়ে ঊর্মিলা পড়ে যায় এবং মারা যায়। এই ঘটনাটি কাদম্বরীর কোমল মনে যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করেছিল। তারপরেও সংসারের কাজকর্ম, স্বামী সেবা, সংগীত, সাহিত্য চর্চা ইত্যাদি দিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে, ভুলে থাকতে চাইলেও শেষ রক্ষা তিনি করতে পারেন নি। সে সময়ই সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনীর কোলকাতার বাসায় , রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্র তাদের বেশীরভাগ সময় কাটাতেন। এরি মধ্যে আবার রবীন্দ্রনাথ বিয়ে করাতে কাদম্বরীর নিঃসংগতা প্রচন্ড বৃদ্ধি পায় যা থেকে তিনি কিছুটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন ও আত্মহত্যার পথটিকেই বেছে নেন।

বাড়িতে কাপড় নিতে আসত বিশ্বেশ্বরী তাতিনী বা বিশু তাতিনী। সেই বিশুকে দিয়েই লুকিয়ে আফিম এনে, খেয়ে তিনি মনের জ্বালা জুড়ান। কাদম্বরীর মৃত্যু নিয়ে তৃতীয় কোন অনুমানের চেয়ে, পারিপ্বার্শিকতার বিচারে বর্নকুমারী বর্নিত কিংবা ইন্দিরার লেখা ঘটনাগুলোই বড় বেশী বাস্তব। কিশোর রবীন্দ্রনাথ জানতেন তার নতুন বৌঠানের সেই গোপন মনোকষ্টের কথা। তার “তারকার আত্মহত্যা”তে তিনি লিখেছেন,

“যদি কেহ শুধাইত, আমি জানি কী যে সে কহিত
যতদিন বেচে ছিল, আমি জানি কী তারে দহিত”

সমসাময়িক অনেক কবিই কাদম্বরীর অকাল মৃত্যুকে নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রের উপর যথেষ্ট বিরক্ত ছিলেন। তাদের অনেকেই সে সময় জ্যোতিরিন্দ্রকে ব্যংগ করে অনেক কবিতা লিখেছিলেন। তাদের কেউ কেউ কোন রাখ ঢাক ছাড়াই স্ত্রীকে অবহেলার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রের সমালোচনা করেছিলেন। কাদম্বরীর কাছ থেকে আসন উপহার পাওয়া কবি

বিহারীলাল চক্রবর্তী জ্যোতিরিন্দ্রের পরনারী আসক্তি নিয়ে শালীনতার আড়াল না রেখেই লিখেছিলেন,

"পুরুষ কিম্ভুতমতি চেনে না তোমায়, মন প্রান যৌবন
কি দিয়া পাইবে মন, পশুর মতন এরা নিতুই নতুন চায়।"

সেসব কবিতা, রচনা, সমসাময়িক ব্যাক্তিদের সাক্ষ্য, আলোচনা ইত্যাদি থেকে ধারনা করা যায় কাদম্বরীর মৃত্যুর সাথে রবীন্দ্রনাথের বিয়েকে জড়িয়ে যে অনুচিত কল্পনা করা হয় তার আসলে কোন ভিত্তি নেই।

(চলবে)
০৭.০৭.০৮